**ATMADEEP**

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
**ISSN: 2454–1508**
**Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)**
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 138-143
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
**DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.189**

# মধ্যযুগের মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর রচনায় প্রকৃতির স্বরূপ ও রূপবৈচিত্র্য

**হুমায়ুন কবির,** *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*

Received: 07.09.2025; Accepted: 11.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Abstract**

As the attraction of humans towards nature is innate, connection is also innate. The form and mystery of nature, the human child of nature, are revealed to writers from time to time in different forms and in different variations. Poet Chandrabati has has described about the nature or environment in her 'Ramayana', 'Sundari Malua' and 'Dasyu Kenaramer Pala'. In Chandrabati's 'Ramayana', the poet has used natural elements of nature to describe the happy life of Sita in the presence of Ramachandra in the leafy cottage of the Panchavati forest. Shakuntala, deer, peacocks, and Shukshari, etc. have accompanied Sita Devi in the Panchavati forest. In the narrative of Chandrabati, the poet has used the context of nature in the context of the intense sorrow and separation of Sita's character. In the description of the ashram of Valmiki Muni after Sita's exile, he has also used natural elements such as animals, birds, plants, etc. to create a sweet environment of the ashram. In the 'Sundari Malua' poem, nature has become meaningful in many ways. The use of nature in describing the proper form of the village of Aralia is consistent with reality and is a very familiar background. The poet has also shown the expression of the calm and gentle form of nature in the background of the meeting of the hero and heroine. The image of nature is also captured through the twelve months composed in the changing natural background of the six seasons in this poem. The poet has shown the background of the image of nature upset by the death of the heroine. In the 'Dasyu Kenaramer Pala', the image of the natural background is consistent with the brutal and cruel activities of the bandit Kenaram. While describing the physical appearance of the robber Kenaram, Chandrabati Devi has taken an analogy from the natural environment of rural folklore. The poet reflects the nature of rural Bengal as seen through his daily eyes, sometimes in the form of metaphors, and sometimes in the form of a favorable environment related to life.

**Keywords:** Bengali Literature, Mediaeval Period, Women poet, Chandrabati, Nature

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ, দশম-দ্বাদশ শতাব্দীতে লেখা। প্রাচীন যুগ নিয়ে সাহিত্য-ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও মধ্যযুগের সময়পর্ব নিয়ে তেমন মতপার্থক্য নেই। ১২০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অন্ধকারপর্ব পেরিয়ে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে কবি ভারতচন্দ্র রায়ের মৃত্যু বা ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্তকে সময় হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। দীর্ঘ এই ছয়শো বছরের সময়পর্বে লিখিত হয়েছে হিন্দু ও মুসলমান কবিদের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়াচারী সাহিত্য যা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে বৈচিত্র্য দান করেছে। বিষয়বৈচিত্র্যের মাঝে সে সময়ের মহিলা কবিদের রচনাও সাহিত্যের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। যদিও পুরুষ-কবি প্রাধান্য মধ্যযুগের সাহিত্যভূমিতে মহিলা কবিদের

রচনা সামান্য। যেসব মহিলা কবিরা সেদিনের পুরুষনিয়ন্ত্রিত সমাজের প্রান্তে অবস্থান করে পড়াশোনা শিখে রচনা করেছিলেন তাঁরা হলেন চন্দ্রাবতী দেবী, মাধবী দেবী, হীরামণি, কৃষ্ণকান্ত-তনয়া, আনন্দময়ী দেবী, গঙ্গামণি দেবী প্রমুখ। এঁদের মধ্যে মনসামঙ্গল রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী রামায়ণ ও গীতিকা রচনা করে উজ্জ্বল হয়েছেন। আমাদের আলোচনা এককভাবে মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর সৃষ্টিজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যে-কারণে আমাদের প্রবন্ধের শিরোনাম পরিকল্পিত হয়েছে— "মধ্যযুগের মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর রচনায় প্রকৃতির স্বরূপ ও রূপবৈচিত্র্য।" এই আলোচনায় ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত এবং ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়, কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'-কে আকর গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ধর্মকেন্দ্রিক। ধর্মকে মূল উদ্দেশ্য করে সাহিত্যসৃষ্টি করার কারণে প্রকৃতির চিত্রণের অবকাশ সেভাবে গড়ে ওঠেনি। মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, বৈষ্ণব পদাবলি প্রভৃতি সাহিত্য শাখা ধর্মকেন্দ্রিক। সমাজের সাধারণ মানুষদের মধ্যে পুরাণ প্রচার করার জন্য রামায়ণ, মহাভারত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এই সব সাহিত্য শাখার সঙ্গে রচিত হয়েছে রোমান্টিক প্রণয়কাব্য। প্রথম রোমান্টিক কাব্যরচনা করেন পঞ্চদশ শতকের শাহ্ মুহম্মদ সগীর। শুধু যে, মুসলমান কবিদের দ্বারা রোমান্টিক প্রণয়কাব্যধারা গড়ে উঠেছিল এমন নয়, হিন্দু কবির কাব্যও এই ধারাকে সমৃদ্ধি করেছিল। ধর্মের মোড়ক থেকে বিচ্ছিন্ন এসব কাব্যের মূল উপজীব্য বিষয় নরনারীর প্রেমকাহিনি। প্রাচ্য থেকে কাহিনি গ্রহণ করে বাংলার প্রকৃতি, নদী, পাহাড়, গাছপালা ব্যবহার করে এসব কাব্যে কবিগণ দেশীয় পটভূমি নির্মাণ করেছেন। কবি চন্দ্রাবতী দেবীও পরিবেশ পটভূমির রূপচিত্রণে এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভাবপ্রকাশে প্রকৃতির স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। কেন-না, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একদিকে যেমন সহজাত আকর্ষণ, তেমনি আবার যোগও নিবিড়। প্রকৃতির মানবসন্তান কবি-সাহিত্যিকদের কাছে প্রকৃতির রূপ ও রহস্য সময়-অসময়ে বিভিন্ন অবয়বে ও বিভিন্ন রূপবৈচিত্র্যে ধরা দেয়। কবিরা কখনও প্রকৃতিকে মানব হিসেবে কল্পনা করেন, আবার কখনও প্রকৃতির বিভিন্ন রূপবৈচিত্র্যকে উপমিত করে কাব্যের রূপসৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করেন।

বাংলা সাহিত্য শুধু নয়, সুবৃহৎ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের পটভূমিতেও প্রকৃতির ভূমিকা উল্লেখনীয়। গুপ্তযুগের কবি কালিদাসের রচনায় দেখা যায় প্রকৃতির চিত্র। তাঁর 'শকুন্তলা', 'ঋতুসংহার' কাব্যে ছাড়াও প্রকৃতির উপাদানকে মুখ্য করে 'মেঘদূত' সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রকৃতির রূপসৌন্দর্যকে অনন্যতায় পরিণত করেছেন। প্রকৃতি ও চরিত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে গাছপালা, নদী, পাহাড় এসব চিত্রায়নের মাধ্যমে যক্ষের অনুভূতিকে উন্মোচন করেছেন। ভবভূতির শ্রেষ্ঠ রচনা 'উত্তররাম চরিত' নাটকে প্রকৃতি চিত্রে কাহিনি নির্মিত। আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও প্রকৃতি নিবিড়ভাবে প্রকটিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)-এর রচনায়। গ্রামবাংলার প্রকৃতির উপাদানকে জীবন্ত করে তুলেছেন তিনি তাঁর রচনায়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে শিলাইদহে জমিদারী দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)-এর প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে থেকে রচিত কাব্য-কবিতায় প্রকৃতি চিত্র প্রতিফলিত।

আমরা এখন আমাদের মূল আলোচনায় প্রবেশ করব। কবি চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণ', 'সুন্দরী মলুয়া' ও 'দস্যু কেনারামের পালা'-য় নিসর্গ প্রকৃতির চিত্রাঙ্কনের পূর্বে কবি-পরিচয় সংক্ষেপে জেনে নেব। বর্তমান বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলায় সতেরো শতকে জন্মগ্রহণ করেন চন্দ্রাবতী দেবী। পিতার নাম দ্বিজ বংশীদাস এবং মাতার নাম অঞ্জনা দেবী। বাল্যে পাঠশালায় পড়তে যেতেন চন্দ্রাবতী। সেখানে জয়ানন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ সন্তানও পড়তে যেতেন। ক্রমে তাঁদের মধ্যে প্রণয় সম্পর্ক স্থাপন হয়। এ যেন অনেকটা বাহ্‌রাম খানের 'লায়লী-মজনু' কাব্যের নায়ক-নায়িকার মতো। তবে লায়লীর মতো চন্দ্রাবতী ছিলেন না, চন্দ্রাবতীর গুরুজনের প্রতি ভয় ও ভক্তি ছিল। একসময় জয়ানন্দ প্রত্যাখ্যান করেন চন্দ্রাবতীকে। এরপর চন্দ্রাবতী অজীবন অবিবাহিত থাকার সিদ্ধান্ত নেন। পিতার নির্দেশে তিনি রামায়ণ রচনা ও শিবপূজা করে কাটিয়ে দেবেন বলে স্থির করেন। অন্যদিকে জয়ানন্দ নিজের ভুল বুঝতে পেরে চন্দ্রাবতীর কাছে ক্ষমা চাইতে আসেন। বারবার চন্দ্রাবতীকে ডেকে কোনো উত্তর না-পেয়ে জয়ানন্দ জীবন ত্যাগ করার সংকল্প করেন। শিবমন্দিরে বিদায় বাণী লিখে ফুলেশ্বরী নদীর জলে আত্মহত্যা করেন। নদীতে জল আনতে গিয়ে এ-দৃশ্য দেখে চন্দ্রাবতী উন্মাদিনীর মতো হয়েছিলেন। একদিন শিবপূজা করার সময় তিনি মারা যান অনুমান করেন পালার সম্পাদকেরা। এই হল তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম রামায়ণ অনুবাদক ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাসের সপ্তকাণ্ড বিশিষ্ট রামায়ণের নৈসর্গিক প্রকৃতির পঞ্চবটী বন, গাছপালা, নদী, পাহাড়, বিভিন্ন প্রাণী চরিত্র প্রভৃতি উপাদানে সমৃদ্ধ। কিন্তু মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর রামায়ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতো সপ্তকাণ্ডবিশিষ্ট নয়, কলেবরের দিক থেকেও এর সঙ্গে তুলনা চলে না। আয়তনে ক্ষুদ্র, স্বল্পদৈর্ঘ্যের চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণ' তিনখণ্ডে বিভক্ত। সীতার কথনে কবি এগিয়ে নিয়ে গেছেন সুতরাং প্রকৃতি উপাদানের ব্যবহার ও বৈচিত্র্য সেভাবে ফুটে ওঠেনি। পঞ্চবটী বনের বিস্তৃত বিবরণও এখানে লব্ধ নয়। গোদাবরী নদীতীরে পঞ্চবটী বনে রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতার সুখেই দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছিল সে-কথা সীতার বক্তব্যে খুব সুস্পষ্ট। পঞ্চবটী বনের লতাপাতার কুটিরে রামচন্দ্রের সান্নিধ্যে সীতার সুখকর জীবন বর্ণনাতে কবি প্রকৃতির নৈসর্গিক উপাদান ব্যবহার করেছেন—

"রসাল বনের ফল গো, পাতার কুটির পাইয়া।
অযোধ্যার রাইজ্যপাট গো, গেলাম যে ভুলিয়া।।
লক্ষ্মণ কানন হইতে আনে মিঠা ফল।
পদ্মপত্রে আমি আনি গো, তমসার জল।।"[১]

প্রকৃতির উপাদান কবি বনবাসের সুখকর পরিবেশ তৈরিতে ব্যবহার করেছেন। শকুন্তলার মতো পঞ্চবটী বনে হরিণ, ময়ূর, শুকশারি প্রভৃতি সীতা দেবীর সঙ্গী হয়েছে। শুকশারি এখানে সীতা দেবীর প্রতিবেশী হয়েছে। কবি মানবেতর প্রাণী চরিত্রকে বাস্তবরূপ দিয়ে মানুষের সখ্য করে এঁকেছেন। সীতা দেবীকে যেমন তারা গান শোনায়, তেমনি কখনও "ঝগড়া বিবাদ করে কভু মোদের সনে।"[২] গোদাবরী নদীতীরে পঞ্চবটী বনের কানন পর্বতে সীতা দেবী রামচন্দ্রের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলত শুকশারি। অবহিত হতে পারা যায় কাননের পাখিদের সঙ্গে তাঁর গভীর ও আত্মিক সম্পর্কের কথা।

তৃতীয় খণ্ডে কবি পঞ্চবটীর মনোরম, মনোরম চিত্র অতিসংক্ষিপ্ত কলেবরে পাঠকের সম্মুখে প্রকটিত করেছেন সীতার কথনে। তপোবনের প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনায় সীতা দেবী বলছেন—

"কমল কাননে হংসী গো সেথায় খেলা করে।।
তমালের ডালে নাচে গো ময়ূরা ময়ূরী।
বনেলা হরিণ আছিল গো মোর সহচরী।"[৩]

এই প্রাকৃতিক দৃশ্য সীতার মধ্যে এক স্বপন ঘোর সৃষ্টি করেছে। অযোধ্যায় ফিরে এসেও সেই সুখকর স্মৃতিগুলি হাতছানি দেয়। প্রতিদিন নিশিতে তপোবনের মনমুগ্ধকর পরিবেশে যাওয়ার অভিলাষী ইচ্ছার স্বপ্নদর্শন ঘটে।

'রামায়ণ'-এ কবি চন্দ্রাবতী সীতা চরিত্রের উপর যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। সহানুভূতিশীল কবি সীতার আনন্দ বা বেদনার সহমর্মী করে তুলতে নদী, পার্থিব চন্দ্র, সূর্যকে ব্যবহার করেছেন। তৃতীয় খণ্ডে রামচন্দ্র দুষ্টবুদ্ধি ভগিনী কুকুয়ার কুচক্রান্তে বিশ্বাস করে নির্দোষী স্ত্রী সীতাকে বনবাসে দেওয়ার সংকল্প করেন। অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে রামচন্দ্র বনবাসে রেখে আসার দায়িত্ব অর্পণ করেন। নির্দোষী সীতা দেবীর বনবাসের মতো শাস্তি কবি যেমন মেনে নিতে পারেননি, তেমনি তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে—

"না উইঠ না উইঠ গো তপন, তুমি মেঘে লুকাও মুখ।...
আকাশের পবন দেব গো, তুমি না বহিও আর।
কেমনে সহিবা পবন গো, এমন নির্দুষীর দুঃখভার।।
ওরে—আকাশ কান্দে বাতাস কান্দে গো আইজ কান্দে নদীর পানি।
আশ্‌মানের তারা কাইন্দ্যা আইজ পোহাইল রজনী।।"[৪]

কবি চন্দ্রাবতী আখ্যানে সীতা চরিত্রের তীব্র দুঃখবেদনা, বিচ্ছেদের প্রসঙ্গে প্রকৃতি প্রসঙ্গের প্রয়োগ করেছেন। কুকুয়ার চক্রান্তে রামচন্দ্র নির্দোষী সীতাকে বনবাস দেওয়ার সংকল্প করেন। সেই বিষাদময় পরিবেশ তৈরি করা এবং নির্দোষী সীতার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে আকাশ, বাতাস, নদীর জলের ক্রন্দন করেছে। বিষাদময় পরিবেশে সহানুভূতি জানিয়ে প্রকৃতির অশ্রুবিসর্জন বর্ণনার মাধ্যমে শোকের আবহ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন।

'রামায়ণ'-এর তৃতীয় খণ্ডের সীতার বনবাস পরবর্তী বাল্মীকি মুনির আশ্রমের বর্ণনায়ও পশুপাখি, গাছপালা প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে আশ্রমের মাধুর্যমণ্ডিত পরিবেশ রচনা করেছেন। সেখানে ব্যাঘ্ররা হরিণের গা-চাটে,

হরিণের কোনো ত্রস্ততা নেই, শঙ্কা নেই। পশুরাজ সিংহের সঙ্গে হস্তীর ভেদ নেই, তারা একসঙ্গে ক্রীড়া করে। শৃগাল ও কুকুর সেখানের পরস্পরের বন্ধু। তপোবন বেষ্টিত বৃক্ষের ফুল বছরব্যাপী ফোটে। প্রভাত হলে শুরু হয় বৃক্ষের ডালে পাখির কূজন এবং তপোবনবাসী চেতনাপ্রাপ্ত হন। সীতা দেবী তপোবনের এই মধুর ও শান্ত পরিবেশে আশ্রয় পান। এক সময়ে লবকুশ নামে দুই যমজ পুত্রের জন্ম দেন। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তীর সঙ্গে ক্রীড়া করেই তারা বড়ো হন। বনের পশুপাখিদের সঙ্গে সখ্যতার সম্পর্ক তৈরি হয়।

'সুন্দরী মলুয়া' পালায় প্রকৃতির অনুসঙ্গ নানাভাবে তাৎপর্য মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। ছয় ঋতুর পরিবর্তমান প্রাকৃতিক আবহাওয়া পালার কাহিনি এবং চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। পালার প্রারম্ভেই নদীমাতৃক বাংলাদেশের খামখেয়ালিপনা প্রাকৃতিক পটভূমির চিত্র কবি তুলে ধরেছেন। অতিবৃষ্টির কারণে জলপ্লাবনে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়েছে। খামখেয়ালিপনা আবহাওয়ার চিত্র তুলে ধরতে পালার প্রারম্ভে কবির বর্ণনা—

> ''মন্দাইন্যা আইশ্নারে পানি ভাটি বাইয়া যায়।...
> মেঘ ডাকে গুড়ু গুড়ু ডাইক্যা তুলে পানি।
> মাঠ ঘাট ডুইব্যা গেল আকুল পরাণি।।''[৫]

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসল নষ্ট হয়ে দেশে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে তারই বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন। কৃষিপ্রধান দেশে ফসল জলে নষ্ট হয়ে আকাল দেখা দেয়। অনুপায় কৃষকসন্তান চাঁদ বিনোদ অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় কোড়া পাখি শিকারে বেরিয়ে পড়ে ঘরে বৃদ্ধা মাকে একাকী রেখে। কোড়া পাখি শিকার ও বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে ঘরে ফিরবে পুত্র এই আশায় সিক্ত নয়নে বিদায় দেয় মা জননী। পালার নায়ক চাঁদ বিনোদ শিকার করতে করতে পৌঁছায় আড়ালিয়া গ্রামে। আড়ালিয়া গ্রামের প্রকৃতিক পটভূমি বর্ণনা—

> "গাঁয়ের পাছে আইন্ধ্যাপুকুর ঝড়-জঙ্গলে ঘেরা।
> চাইর দিগে কলাগাছ মান্দার গাছের বেড়া।।"[৬]

গ্রামবাংলার যথাযথ রূপ বর্ণনায় প্রকৃতির অনুসঙ্গের প্রয়োগ বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং খুব পরিচিত একটি পটভূমি। পথশ্রমের ক্লান্তি অপনোদনে চাঁদ বিনোদ পুকুরপাড়ের ছায়া নিবিড় শান্ত শ্যামল কদমগাছের তলে দিবানিদ্রা দিয়েছে। সন্ধ্যাবেলা নির্জন পুকুরে নায়িকা সুন্দরী মলুয়া কলসি নিয়ে জল আনতে গেলে একে অপরের মধ্যে প্রেম সন্দর্শন ঘটে। নায়ক-নায়িকার মিলনের পটভূমিতেও প্রকৃতির শান্ত-স্নিগ্ধ রূপের প্রকাশ কবি দেখিয়েছেন। পালার নায়ক-নায়িকার মিলনে প্রকৃতির স্বরূপ প্রসঙ্গে মান্য সমালোচক বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে—

> "চান্দ বিনোদকে পুকুরঘাটে প্রত্যক্ষ করে মলুয়ার যুবতী মনে যে পূর্বরাগ সঞ্চারিত হয়, আষাঢ় মাসের বর্ষণসিক্ত ধরণী ও কানায় কানায় পূর্ণ নদীর উচ্ছলতার মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ ঘটানো হয়। মেঘের ডাকের মধ্যে মলুয়া তার প্রিয়তমের কণ্ঠধ্বনি যেন শুনতে পায়।"[৭]

ছয় ঋতুর পরিবর্তিত প্রাকৃতিক পটভূমিকায় রচিত বারোমাস্যার মধ্য দিয়েও প্রকৃতি চিত্র ধরা পড়ে। বারোমাস্যার সাহিত্যিক রূপ প্রথম লক্ষ করা যায় 'মঙ্গলকাব্য'-এ। বারোমাস্যা বর্ণনায় প্রকৃতি চিত্রণের বৈচিত্র্য জীবনরসিক কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী ছাড়া অপরাপর কবিদের রচনায় গতানুগতা ধরা পড়ে। এই পালায় বারোমাস্যার পৃথক পৃথক দু-বার বর্ণনা রয়েছে। একটিতে আট মাসের বিবরণ অর্থাৎ অষ্টমাসি, একটিতে দশমাসের বিবরণ অর্থাৎ দশমাসি বা দশমাস্যা। এই বারোমাসি বর্ণনায় বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি পরিচয়ের পাশাপাশি বিরহিণী নারীর মনের ভাবপ্রকাশ পায়। যেমন আষাঢ়ের অঝোর বারিধারায় এবং বিদ্যুৎ বিজড়িত মেঘের ক্ষীণ তাৎক্ষণিক দর্শনে স্বামী সংসর্গের বাসনায় গৃহশয্যায় একাকী স্বামীর কথাই স্মরণ হয়—

> ''মেঘ ডাকে গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে রইয়া।
> সোয়ামীর কথা ভাবে কন্যা খালি ঘরে শুইয়া।।''[৮]

চরিত্রের মনের ভাবপ্রকাশে কবি প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের সম্পৃক্ততা তুলে ধরেছেন, তেমনি আবার পালার সমাপ্ত অংশেও নদীসংকুল বাংলাদেশের খামখেয়ালিপনা আবহাওয়ার চিত্র ব্যবহার করে নায়িকার অন্তিম পরিণতি দেখানো হয়েছে—

> ''পূবাইলে গর্জিল দেওয়া ছুটল বিষম বাও।
> কই বা গেল সুন্দর কন্যা মনপবনের নাও।।''[৯]

অসতীত্বের মিথ্যা কলঙ্কিত আখ্যা পেয়ে মলুয়া যেমন স্বামী চাঁদ বিনোদকে পায়নি, তেমনি সংসারেও ঠাঁই হয়নি। তাই সে সমাজের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ জানিয়েছে আত্মহননের মধ্য দিয়ে। তার সলিল সমাধিতে প্রকৃতির বিক্ষুব্ধ চিত্রের পটভূমি কবি নির্মাণ করেছেন। এভাবে আলোচনা করলে দেখা যায়, পালায় কবি বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যে, কখনও দৈহিক সৌন্দর্য তথা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশে কিংবা মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অনুসঙ্গে প্রকৃতির প্রাসঙ্গিক ব্যবহার করেছেন।

কবির পিতৃদেব তথা মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাসের বাস্তব জীবনকে কেন্দ্র করে কন্যা চন্দ্রাবতী কর্তৃক লিখিত 'দস্যু কেনারামের পালা'। পালাটির রচনাকাল ষোলো শতকের শেষ বা সতেরো শতকের প্রথম। বাস্তবতা নির্ভর এই পালার মাধ্যমে সে সময়ের রাজনৈতিক সামাজিক চিত্রের সঙ্গে প্রকৃতির চিত্রও উঠে আসে। জলাভূমি ও জঙ্গলবেষ্টিত অঞ্চল ময়মনসিংহের বাস্তব প্রকৃতি চিত্রে কবির বর্ণনা—

"গারুয়া পাহাড় হইতে জালিয়ার হাওড়।
ঘর বাড়ী নাই কেবল নল-খাগড়ের গড়।।"[১০]

জনশূন্য নিবিড় জঙ্গলে বন্যপশুর মতো ডাকাত দলের দৌরাত্ম্য ছিল। পালার নায়ক দস্যু কেনারাম নৃশংস নিদারুণ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রাকৃতিক পটভূমির চিত্র সামঞ্জস্যপূর্ণ। কবি চন্দ্রাবতীর পিতা দ্বিজ বংশীদাসের সঙ্গে এই জঙ্গলঘেরা পথে দস্যু কেনারামের আকস্মিক সাক্ষাৎ হলে দস্যু তাঁদের হত্যা করতে উদ্যত হয়। তখন বংশীদাস দস্যুর মন গলাতে মনসার ভাসানগান গান। বংশীদাস কেনারামের অনুমতি নিয়েই এই গান গেয়েছিলেন। ভাসানগান শ্রবণে হাওড়ের পশুপাখি, গাছপালা কিরূপ ধারণ করেছেন কবি তার বর্ণনা দিয়েছেন—

"উইড়্যা যায় আশমানের পঙ্খী আইস্যা বইল ডালেতে।
বন ছাইড়্যা আইল পশু গাহান শুনিতে।।
চৈতের চৈতালি হাওয়া থির হইয়া রয়।
বৃক্ষ সবে থির হইয়া পাতা না নড়ায়।।
আশমানের চান্দের আলো তারা রইল চাইয়া।"[১১]

দস্যু কেনারামের আত্ম-উন্মচনের কাহিনিই এ-পালার ভরকেন্দ্র। কবি দেখিয়েছেন দ্বিজ বংশীদাসের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়েই তার মানবিক বোধের বিকাশ ঘটে। এই বোধের বিকাশে ভাসানগান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালান করে। গুরুত্ব ও তাৎপর্য বোঝাতে প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিভোর করে তুলেছেন।

কবি কাব্যের আঙ্গিক সৌন্দর্যে সেসব অলংকার প্রয়োগ করেছেন সেখানেও প্রকৃতি জগৎ থেকে উপমান চয়ন করেছেন। যেমন লোকায়ত বা লৌকিক উপমা প্রয়োগ করেছেন 'দস্যু কেনারামের পালা'-য় ঘটনা বা লোকায়ত চরিত্রের দৈহিক বর্ণনা প্রসঙ্গে। ডাকাত কেনারামের দৈহিক বর্ণনা করতে গিয়ে চন্দ্রাবতী দেবী অতি পরিচিত লোকায়ত প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে উপমা গ্রহণ করেছেন—

(১) ''হাত পায়ের গোছা তার কলা গাছের গোড়া।''[১২]
(২) ''সুগোল সুঠাম অঙ্গ পাকা সব্‌রি কলা।''[১৩]

**উপসংহার:** কবি চন্দ্রাবতী তাঁর 'রামায়ণ', 'সুন্দরী মলুয়া' ও 'দস্যু কেনারামের পালা'য় পরিবেশ পটভূমির রূপ চিত্রণে এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভাবপ্রকাশে প্রকৃতির স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। নির্দোষী সীতার আজান্তেই যখন তাঁকে নিয়ে দেবর লক্ষ্মণ বনবাসযাত্রা করবেন ঠিক তখনই প্রকৃতির নদী পাহাড় প্রভৃতি সহানুভূতিতে ব্যথিত হয়ে ওঠে। বনবাসে গিয়ে আশ্রয় পান বাল্মীকি মুনির আশ্রমে। আশ্রমের গাছপালা, পশুপাখির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাল্মীকি তপোবনের শান্ত-স্নিগ্ধ বৈচিত্র্যময় পরিবেশের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনায় প্রকৃতিতে মুখ্য করে তুলেছেন। 'সুন্দরী মলুয়া' পালার প্রারম্ভে বাংলার খামখেয়ালিপনা প্রকৃতির রূপকে সজীব করে তুলেছেন। মলুয়ার অন্তিম পরিণতিতে কিংবা দস্যু কেনারামের ভাসানগান শ্রবণের সময় প্রকৃতির স্বরূপ অকৃত্রিম। কবির প্রত্যাহিক চোখে দেখা গ্রামবাংলার প্রকৃতির রূপকে প্রতিফলন করেছেন উপমানরূপে কখনও আবার জীবন-সম্পৃক্ত অনুকূল পরিবেশ রচনায়।

**তথ্যসূত্র:**

১. মৌলিক, ক্ষিতীশচন্দ্র সম্পাদনা। প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (সপ্তম খণ্ড) । ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৫, কলকাতা, পৃ. ৩১১।

২. তদেব, পৃ. ৩১২।
৩. তদেব, পৃ. ৩২২।
৪. তদেব, পৃ. ৩২৮।
৫. ঐ, প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (প্রথম খণ্ড) । ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭০, কলকাতা, পৃ. ১০০-১০১।
৬. তদেব, পৃ. ১০৭।
৭. চক্রবর্তী, বরুণকুমার। গীতিকা: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য। পুস্তক বিপণি, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ১১০।
৮. মৌলিক, ক্ষিতীশচন্দ্র সম্পাদনা। পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ. ১৬২।
৯. তদেব, পৃ. ২০১।
১০. তদেব, পৃ. ২৫৭।
১১. তদেব, পৃ. ২৭৪।
১২. তদেব, পৃ. ২৫৯।
১৩. তদেব, পৃ. ২৫৩।

**সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:**

১. চক্রবর্তী, বরুণকুমার। গীতিকা: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য। পুস্তক বিপণি, ২০১৫, কলকাতা।
২. মৌলিক, ক্ষিতীশচন্দ্র সম্পাদনা। প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (প্রথম খণ্ড) । ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭০, কলকাতা।
৩. মৌলিক, ক্ষিতীশচন্দ্র সম্পাদনা। প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (সপ্তম খণ্ড) । ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৫, কলকাতা।